এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) استقامة এর সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ ফরয কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, استقامة এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, استقامة-এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত উমর (রা) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ—ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ্ বলেন—হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ্ বলেন, তিন সময়ে হবে---প্রথম মৃত্যুর সময়, অতপর কবরের অভ্যন্তরে, অতপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহ্‌রে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন----আমি তো বলি যে, মু'মিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুস দেখা ও তাদের কথা শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বানানী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম সিজদা তিলাওয়াত করত আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মু'মিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না ; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মু'মিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। ---(মাযহারী)

لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ---ফেরেশতাগণ মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে---তোমরা চাও বা না চাও। অতপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত যখন কোন বড় লোকের মেহমান হয়।---(মাযহারী)

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে।---(মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে।---(মাযহারী)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ—এটা মু'মিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করে। একারণেই হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَا إِلَى اللَّهِ বাক্যের পর وَعَمِلَ صَالِحًا বলে আযান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত নামায বোঝানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।---(মাযহারী)

হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেওয়ার অনেক ফযিলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযান দেওয়া হয়।----(মাযহারী)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ—এখান থেকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতকারী-দেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ—অর্থাৎ দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস

বলেন--এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মুকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। --(মাযহারী)

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।-- (কুরতুবী)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۭ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝۳۷
فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔـمُوْنَ ۝۳۸ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً
فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا
لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۳۹

(৩৭) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না ; আল্লাহ্কে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। (৩৮) অতপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না। (৩৯) তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দ্র তাঁরা (কুদরত ও তওহীদের) অন্যতম নিদর্শন (অতএব) তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না, [সাবেয়ী সম্প্রদায় নক্ষত্ররাজির

ইবাদত করত। (কাশশাফ)] আল্লাহ্কে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত কর। (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করতে হলে তা এভাবেই হতে পারে যে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মুশরিকদের মত আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে অন্যকে ইবাদতে শরীক করলে তা আল্লাহ্র ইবাদত থাকে না।) অতপর যদি তারা (তওহীদের ইবাদত অবলম্বন করতে এবং পৈতৃক বদভ্যাস শিরক পরিত্যাগ করতে লজ্জা ও) অহংকার করে, তবে (সেটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। কেননা) যেসব (ফেরেশতা) আপনার পালনকর্তার নৈকট্যশীল, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা (এ থেকে সামান্যও) ক্লান্ত হয় না। (তাদের চেয়ে বহুগুণে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহ্র ইবাদতে লজ্জাবোধ করে না, তখন এ বোকাদের লজ্জাবোধ করার কি আছে?) তাঁর (কুদরত ও তওহীদের) এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর বারিবর্ষণ করি, তখন সে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (এটা তওহীদ ও পুনরুত্থান উভয়েরই দলীল। কেননা) যিনি ভূমিকে (তার উপযুক্ত) জীবন দান করছেন, তিনিই মৃতদেরকে (তাদের উপযুক্ত) জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা জায়েজ নয়ঃ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ

وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ—এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোন নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সিজদা করা হারাম। এই সিজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সিজদা করলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করলে তাকে কাফির বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসিক বলা হবে।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা কোন উম্মত ও শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। ইউসুফ (আ)-কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ সিজদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ---এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবূবকর আহ্‌কামুল কোরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ (রা) প্রথম আয়াত অর্থাৎ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ---এর শেষে সিজদা করতেন। ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ لَا يَسْئَمُونَ--এর শেষে সিজদা করতেন। হযরত ইবনে উমরও তাই বলেছেন। একারণে মসরূক, আবূ আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ্ প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সিজদা করতেন। আহকামুল কোরআনে আরও বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলিমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সিজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে প্রথম আয়াতে সিজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن
يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا
شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا
جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَّا يُقَالُ لَكَ
إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ
أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ
وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ

بِعَبِيْدٍ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ
مُرِيْبٍ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا
رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা কর। (৪১) নিশ্চয় যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ (৪২) এতে মিথ্যার প্রভাব নেই সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৩) আপনাকেতো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৪) আমি যদি একে অনারব ভাষায় কোরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল আরবীভাষী! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়। (৪৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। তারা কোরআন সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত (৪৬) যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, (অর্থাৎ আমার আয়াতসমূহের দাবি হল ঈমান আনা এবং তাতে অবিচল থাকা, তারা এ দাবি উপেক্ষা করে আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে)।---(দুররে-মনসূর) তারা আমার কাছে গোপন নয়। (আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেব।) যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপদে (জান্নাতে) আসবে সে? (অতপর কাফিরদেরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে,) তোমরা যা ইচ্ছা,

(খুব) করে নাও। তিনি তোমাদের সমস্ত কর্মই দেখেন। (একবারই শাস্তি দেবেন।) যারা কোরআন পৌঁছার পর তাকে অস্বীকার করে, (তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। কোরআনে কোন অভাব নেই। কেননা,) এটা (কোরআন) এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে অবাস্তব কথা সামনের দিক থেকেও আসে না এবং পেছন দিক থেকেও না। (অর্থাৎ এতে কোন দিক থেকেই এরূপ সম্ভাবনা নেই যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়।) কাফিররা এ সন্দেহই করত। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের সর্বজন স্বীকৃত অলৌকিকতা দ্বারা সন্দেহ দূর করে দিলেন। তাই প্রমাণিত হল যে, এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (এতদসত্ত্বেও তাদের মিথ্যারোপের জওয়াবে একথা জেনে সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আপনাকে (মিথ্যারোপ ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে) সে কথাই বলা হয়, যা পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়েছে। (তারা সবর করেছিল, আপনিও সবর করুন এবং এভাবেও সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও বটে। (সুতরাং কাফিররা কুফর থেকে বিরত হয়ে ক্ষমাযোগ্য না হলে) আমি তাদেরকে শাস্তিও দেব। (অতএব আপনি পেরেশান হবেন কেন? কাফিরদের এক আপত্তি এই যে, কোরআনের কিছু অংশ অনারব ভাষায়ও থাকা উচিত ছিল। দুররে মনসূরে কাফিরদের এরূপ উক্তি সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত রয়েছে। এর ফলে কোরআনের অধিকতর অলৌকিকতা ফুটে উঠত। মানুষ দেখত যে, পয়গম্বর অনারব ভাষা জানেন না তবুও সে ভাষায় কথা বলেন। ব্যাপার এই যে,) যদি আমি একে (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অনারব ভাষার কোরআন করতাম, (তবে কখনও তারা তাও মানত না, বরং এতে আরও একটি খুঁত বের করত। কারণ, মেনে নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে কোন না কোন খুঁত বের করাই নিয়ম। সেমতে এরূপ হলে) অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? (অর্থাৎ আরবী ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন, যাতে আমরা বুঝতাম! আংশিক অনারব ভাষায় থাকলে বলত, সম্পূর্ণই আরবী ভাষা হল না কেন? তারা আরও বলত,) কি আশ্চর্য অনারব ভাষার কিতাব, অথচ রসূল হলেন আরবী! (সার কথা এই যে, তারা এখন আরবী কোরআন দেখে বলে, অনারব ভাষায় হল না কেন? অনারব ভাষায় থাকলে বলত, আরবী হল না কেন? তারা কোন অবস্থাতেই আশ্বস্ত নয়। সুতরাং অনারব ভাষায় হলে তাতে কি ফায়দা হত? অতপর জওয়াব দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে,) আপনি বলুন, এটা (কোরআন) মু'মিনদের জন্য (সৎকাজের) পথ প্রদর্শক এবং (মন্দকাজের ফলে অন্তরে যে রোগ সৃষ্টি হয়, কোরআন সে) রোগের প্রতিকার। (মু'মিনদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও সত্যান্বেষণের অভাব ছিল না। তাই কোরআন তাদের জন্য উপকারী হয়েছে।) যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি। (ফলে ইনসাফ ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে সত্যকে শোনে না।) আর (এ কারণেই) কোরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূর্য যেমন জগৎকে আলোকিত করে এবং বাদুরকে অন্ধ করে দেয়, তাদের সত্য শোনেও উপকার থেকে বঞ্চিত থাকা এমনি, যেমন) তাদেরকে কোন দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হয়। [ফলে আওয়ায শোনে, কিন্তু বুঝে না।

আপনার সান্ত্বনার জন্য উপরে সংক্ষেপে পয়গম্বরগণের আলোচনা হয়েছে। এখন বিশেষভাবে মূসা (আ)-র আলোচনা শুনুন,] আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। (কেউ মেনে নিয়েছে আর কেউ মেনে নেয়নি। কাজেই এটা নতুন বিষয় নয়। আপনি দুঃখিত হবেন না। কাফিরা আযাবেরই যোগ্য। তাই) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত (অনুযায়ী পূর্ণ আযাব পরকালে দেওয়ার ব্যবস্থা) না থাকত, তবে তাদের (চূড়ান্ত) ফয়সালা (দুনিয়াতেই) হয়ে যেত। তারা (প্রমাণাদি কায়েম থাকা সত্ত্বেও) এ (ফয়সালা তথা প্রতিশ্রুত আযাব) সম্বন্ধে দ্বিধা-দ্বন্দ্বপূর্ণ সন্দেহে পতিত রয়েছে। (তারা আযাব বিশ্বাসই করে, অথচ ফয়সালা অবশ্যই হবে। ফয়সালার সারমর্ম এই যে,) সে সৎকর্ম করেনা, সে নিজের উপকারের জন্যই করে (অর্থাৎ, সেখানে তার উপকার ও সওয়াব পাবে) এবং যে মন্দকর্ম করে, তা (অর্থাৎ তার ক্ষতি ও শাস্তি) তারই উপর বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন (অর্থাৎ শর্ত অনুযায়ী সৎকর্ম করা হলে তিনি তা গণনা থেকে বাদ দেন না এবং কোন অসৎকর্ম বাড়িয়ে গণনা করেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কুফরেরই বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান ঃ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ

فِي آيَاتِنَا এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। الحاد ও لحد -এর আভিধানিক অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা কবরকেও একারণেই لحد বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাশ কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যত ঈমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ্ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্দ্বারা কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, الا لحاد هو وضع الكلام على غير موضعه আয়াতের لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি

কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ্ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী।

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ মুখে কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) কিতাবুল খেরাজে বলেন, كذالك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফিরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান ঃ আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফির নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয় যে, যে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফির হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহুদী খৃস্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফির বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কোরআনে উল্লিখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্য করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহ্রই ইবাদত করি। কিন্তু কোরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফিরই বলেছে। ইহুদী ও খৃস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্র বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফির না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলিম ও ফিকাহ্বিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে

অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়া, ফজরের দু'রাকআত ও যোহরের চার রাকআত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোরআনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপে ও সর্বসম্মতভাবে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলিমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به ضرورة —অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে নবী করীম (সা)-এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্বল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে; অর্থাৎ আলিমগণ তো জানেনই —সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিশ্চিত ও জাজ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে অস্বীকার করা।

অতএব যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাপকতা ঃ বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অজ্ঞ। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহ্ বিহীন, বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে; অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কোরআন ও হাদীসের অকাট্য ও জাজ্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরীয়তের সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলীর পরিবর্তন করাকে ইসলামের খিদমত মনে করে নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরোক্ত প্রসিদ্ধ নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না, বরং এতে অর্থ সংযোজন করি মাত্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না।

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কোরআনের আয়াতে এলহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। এক. যে অর্থ কোরআন-হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অকাট্য ইজমার পরিপন্থী, এটা

নিঃসন্দেহে কুফর এবং দুই. যা কোরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্তু নিশ্চয়তার নিকটবর্তী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থী। এটা গোমরাহী ও পাপাচার (ফিস্‌ক)—কুফর নয়। এ দু'প্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কোরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ ফিকাহ্‌বিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ—অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذكر বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ বাক্যটি পূর্ববর্তী إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا—বাক্য থেকে بدل হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা যেহেতু আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আযাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ—এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ্ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে باطل বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাদ্দিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জ্বিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবূ-হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল কোরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপন্থীর সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই।

তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, কোরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই। এক. খোলাখুলিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন

করার চেষ্টা করা। একে مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. বাহ্যত ঈমান দাবি করা কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে مِنْ خَلْفِهِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এর অর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বোঝে। কোরআন চৌদ্দ শ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলিম থেকে জাহিল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বলে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ সম্ভারের হিফাযত করাও আল্লাহ্ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরিদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেদ্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলিম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বাক্যে لَهُ-এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল ভাষার নাম নয়; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যত মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের হিফাযত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলিমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কোরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই

গোপন করুক, আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

أَعْجَمِي وَعَرَبِي —আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে أَعْجَم বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুত أَعْجَمِي বলা হবে তাকেই যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না।—(কুরতুবী)

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় কোরআন নাযিল করতাম, তবে কোরায়েশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ —এখানে কোরআনের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে—এক. কোরআন হিদায়ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথপ্রদর্শন করে—দুই. কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কোরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফল হয়।

أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ —এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে أنت تسمع من قريب অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে أنت تنادى من بعيد অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে।—(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হিদায়ত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়ায পৌঁছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ

شُرَكَاۤءِيْ ۙ قَالُوْۤا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾
لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاۤءِ الْخَيْرِ ۫ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ
قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّاۤءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ
هٰذَا لِيْ ۙ وَمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَاۤئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْۤ اِنَّ
لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾ وَاِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ
بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاۤءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ
هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْۤ اَنْفُسِهِمْ
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۚ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾ اَلَاۤ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۤءِ رَبِّهِمْ ۗ اَلَاۤ
اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তারই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। (৪৮) পূর্বে তারা যাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (৪৯) মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার

যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি। (৫১) আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, অতপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (৫৩) এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫৪) শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে যে কিয়ামতে কাফিররা প্রতিফল পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া যায়। (অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকৃতি প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করত, কিয়ামত কবে আসবে? এর জওয়াবে একথাই বলা হবে যে, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। মানুষের কাছে এর জ্ঞান নেই বলে এর অবাস্তবতা জরুরী হয় না। আর কিয়ামতেরই কি বিশেষত্ব, আল্লাহ্‌র জ্ঞান তো সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি,) কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু এসবই তাঁর জ্ঞাতসারে হয়। (কেননা, তাঁর জ্ঞান সত্তাগত, যা চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে তওহীদের প্রমাণ এবং কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানেরও প্রমাণ। অতপর কিয়ামতের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদ্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত ও শিরক মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।) যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, (যাদেরকে তোমরা আমার শরীক স্থির করেছিলে), আমার (সেই) শরীকরা (এখন) কোথায়? (তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুক।) তারা বলবে, (এখন তো) আমরা আপনার কাছে নিবেদন করছি যে, আমাদের কেউ এটা (অর্থাৎ শিরক) স্বীকার করে না। (অর্থাৎ আসল সত্য ফুটে উঠার পর তারা তাদের ভুল স্বীকার করে নেবে। এটা হয় অপারক অবস্থার স্বীকারোক্তি, না হয় কিছুটা মুক্তির আশায় এ স্বীকারোক্তি করা হবে।) পূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তারা যাদের পূজা করত, তারা সকলেই উধাও হয়ে যাবে এবং তারা (এসব অবস্থা দেখে) বোঝে নেবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। (তখন মিথ্যা খোদাদের অসহায়ত্ব এবং এক আল্লাহ্‌র সত্যতা জানা যাবে। অতপর মানব-স্বভাবের উপর কুফর ও শিরকের একটি বড়

প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ তওহীদ ও ঈমান থেকে মুক্ত, সে) মানুষ (চরিত্র, বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে এত মন্দ যে, প্রথমত স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাব-অনটন কোন অবস্থাতেই সে) উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না, (এটা চরম লোভ-লালসার আলামত।) আর (বিশেষ দুঃখ-দৈন্যে তার অবস্থা এই যে,) যদি তাকে কিছু অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। (এটা চরম অকৃতজ্ঞতা ও আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করার আলামত।) আর (দুঃখ-দৈন্য দূর হয়ে গেলে তার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই; তখন সে বলে, এটা তো আমার প্রাপ্যই ছিল। (কেননা, আমার কলাকৌশল, প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব এরই দাবীদার ছিল। বস্তুত এটাও চরম অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার।) এবং (এতে সে এতদূর স্ফীত ও বিস্মৃত হয় যে, বলতে শুরু করে,) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি (অগত্যা সংঘটিত হয়েই যায় এবং) আমি আমার পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, (যেমন, পয়গম্বর বলে,) তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। (কেননা, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরই যোগ্য পাত্র। এটা আল্লাহ্র ব্যাপারে চরম ধোঁকায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। মোটকথা, কুফর ও শিরক এমনি অনিষ্টকর ব্যাপার।) অতএব (তারা যত যোগ্যতার দাবিই করুক, সত্বরই) আমি কাফিরদেরকে অবশ্যই তাদের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব। (কুফর ও শিরকের আরও একটি প্রতিক্রিয়া এই যে,) আমি যখন (কাফির ও মুশরিক) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে (আমার দিক থেকে ও আমার বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে (যা চরম অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ বটে।) আর (দুঃখ-দৈন্যের ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকের এক প্রতিক্রিয়া এই যে,) তাকে যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন (নিয়ামত হারানোর ফলে হা-হুতাশের ছলে--- যা অনুনয়-বিনয়ের ছলে হয়) খুব লম্বা-চওড়া দোয়া করতে থাকে। (এটা চরম অধৈর্যতা ও দুনিয়াপ্রীতির আলামত। অতপর রিসালত ও কোরআনের সত্যতার দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছেঃ হে পয়গম্বর,) আপনি (কাফিরদেরকে) বলুন, (কোরআনের সত্যতার পক্ষে যেসব প্রমাণ বিধৃত রয়েছে, যেমন, এর অনন্যতা, অদৃশ্যের সঠিক খবর দান প্রভৃতি, চিন্তা-ভাবনার অভাবে তোমরা এগুলোকে বিশ্বাস স্থাপনের কারণ মনে না করলে, কমপক্ষে তার সম্ভাব্যতাকে তো অস্বীকার করতে পার না। কেননা, এর পক্ষে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। অতএব) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসে থাকে, অতপর তোমরা একে অস্বীকার কর, তবে সে ব্যক্তির চাইতে অধিক ভ্রান্ত আর কে, যে (সত্যের) ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত? (তাই তড়িঘড়ি অস্বীকার করো না, বরং ভেবে-চিন্তে দেখ, যেন সত্য ফুটে উঠে। অবশ্য তাদের কাছে এরূপ চিন্তা-ভাবনার আশা করা বৃথা। তাই) এখন আমি (নিজেই) তাদেরকে আমার (কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব

(যা রয়েছে) পৃথিবীর দিগন্তে (যেমন, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে) এবং (যা রয়েছে) তাদের নিজেদের মধ্যে (যেমন, বদরে তারা নিহত হবে এবং তাদের বাসস্থান মক্কা বিজিত হবে।) ফলে (এসব ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার কারণে) তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। (এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে। এই অপারগ অবস্থার জ্ঞান যদিও গ্রহণীয় নয়; কিন্তু এতে প্রমাণ আরও জোরদার হবে। তবে বর্তমানে তাদের অস্বীকারের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, তারা যদি আপনার সত্যতার সাক্ষ্য না দেয়, তবে) আপনার পালনকর্তার কথা (আপনার সত্যতার সাক্ষ্য ও সান্ত্বনার জন্য) যথেষ্ট নয় কি? তিনি প্রত্যেক (বাস্তব) বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। (তিনি আপনার রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতপর কাফিরদের অস্বীকৃতির প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে সান্ত্বনাও অধিক হতে পারে।) জেনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। (ফলে তাদের অন্তরে এমন ভয়ও নেই যার কারণে সত্যান্বেষণ করবে; কিন্তু) জেনে রাখ, তিনি সবকিছুকে (জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন (সুতরাং তাদের সন্দেহ সম্পর্কেও তিনি জানেন এবং এর শাস্তি দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ—অর্থাৎ কাফির লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন নিয়ামত, ধনসম্পদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এ স্থলে عريض অর্থাৎ প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ বলেছেন; অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি ও বার-বার বলা উত্তম---।---(বুখারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এ স্থলে কাফিরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে

উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ—অর্থাৎ আমি আমার কুদরত ও তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। اٰفَاق শব্দটি اُفُق--এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ব-জগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক-একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরি হলে ইস্পাত নির্মিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যাঁর কোন সমকক্ষ হতে পারে না। فتبارك الله احسن الخالقين

سورة الشورى

সূরা শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ عٓسٓقٓ ۝٢ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ
اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝٤ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ
لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٥ وَالَّذِيْنَ
اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٦ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝٧ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ
مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ
فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হা-মীম, (২) আইন, সীন, ক্বা-ফ। (৩) এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। (৪) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। তিনি সমুন্নত, মহান। (৫) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব। (৭) এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশে-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। (৯) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? পরন্তু আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম, আইন-সীন, ক্বা-ফ—(এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। ধর্মের মূলনীতি নিরূপণ ও অন্যান্য মহা-উপকারের জন্য যেমন আপনার প্রতি এ সূরা নাযিল হচ্ছে,) এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি (অন্যান্য সূরা ও কিতাবের) ওহী প্রেরণ করেন। (তাঁর শান এই যে,) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর, তিনিই সমুন্নত, মহান। (মর্তবাসীরা যদি তাঁর মাহাত্ম্য না বুঝে ও না মানে, তবে আকাশে তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞানী এত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা রয়েছে যে, তাদের বোঝার কারণে) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, (যেমন হাদীসে আছে ঃ اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربعة اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله——অর্থাৎ আকাশে এমন আওয়ায হতে লাগলো, যেমন কোন বস্তুর উপর বেশি বোঝা চেপে যাওয়ার কারণে হয়। আর এরূপ আওয়ায হওয়াই সঙ্গত। কেননা, সমগ্র আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা মস্তক ঠুকে সিজদারত না আছে) ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং মর্তবাসীদের (মধ্যে যারা তাঁর মাহাত্ম্য বুঝে না এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত আছে, ফলে আযাবের যোগ্য হয়ে গেছে, সেই ফেরেশতাগণ তাদের) জন্য (বিশেষ সময় পর্যন্ত) ক্ষমা

প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ এ দোয়া করে যে, দুনিয়াতে তাদের উপর যেন কঠোর আযাব নাযিল না হয়, যার ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য শাস্তি ও পরকালের প্রকৃত আযাব এই ক্ষমার প্রার্থনার বাইরে। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের এই দোয়া কবুল করে কাফিরদেরকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।) জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মন্দ কর্মের) প্রতি দৃষ্টি রাখেন (উপযুক্ত সময়ে এর শাস্তি দেবেন)। আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন (যে যখন ইচ্ছা, তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। তাদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়; কেননা, আপনার প্রচার কাজ আপনি করেছেন। এর বেশী কোন কিছুর চিন্তা করবে না। সেমতে) আমি এমনিভাবে (যেমন আপনি দেখছেন) আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি (সর্বপ্রথম) মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমবেত হওয়ার দিন (অর্থাৎ কিয়ামত) সম্পর্কে (যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ এক ময়দানে একত্রিত হবে)--এতে মোটেই সন্দেহ নেই। (সেদিন ফয়সালা হবে যে,) একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। (সুতরাং আপনার কাজ কেবল সেদিন সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদের ঈমান আনা না আনা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে এক সম্প্রদায়ে পরিণত করতে পারতেন (অর্থাৎ সকলেই মু'মিন হতে পারত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে হেদায়েত দিতে পারতাম।) কিন্তু (অনেক রহস্যের কারণে তিনি তা চাননি; বরং) তিনি যাকে ইচ্ছা (ঈমান দিয়ে) স্বীয় রহমতে দাখিল করেন (এবং যাকে ইচ্ছা, কুফর ও শিরকের মধ্যে ছেড়ে দেন! ফলে সে রহমতে দাখিল হয় না।) আর জালিমদের (অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত কিয়ামতের দিন) কোন অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারী নেই। (অতপর শিরক বাতিল করা হয়েছে,) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে। পরন্তু (যদি অভিভাবক করতে হয়, তবে) আল্লাহ্ তা'আলাই তো অভিভাবক (হওয়ার যোগ্য)। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান (অতএব অভিভাবক করার যোগ্য তিনিই। তাঁর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বিষয়ের উপর নামেমাত্র কিছু ক্ষমতা অন্যদের রয়েছে, কিন্তু মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতায় অন্য কেউ নামেমাত্রও শরীক নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَتَفَطَّرْنَ--এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়ায সৃষ্টি হয়, যেমন কোন বস্তুর উপর ভারী বোঝা

পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী, এটা অবান্তরও নয়। কেননা, এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম দেহও বহুসংখ্যক একত্রিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়। ---(বয়ানুল কোরআন)।

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى—ام القرى—এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাযূরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

انك لخير ارض الله و احب ارض الله الى و لو لا انى اخرجت منك لما خرجت —তুমি আমার কাছে আল্লাহ্র সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

وَمَنْ حَوْلَهَا---অর্থাৎ মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশেপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ڰ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝١٠ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۭ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١١ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝١٢

(১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ্---আমার পালনকর্তা। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই

অভিমুখী হই। (১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যারা তওহীদে আপনার সাথে মতভেদ করে, আপনি তাদেরকে বলুন,) যেসব বিষয়ে তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সোপর্দ রয়েছে। (তা এই যে, তিনি দুনিয়াতে প্রমাণাদি ও মু'জিযার মাধ্যমে তওহীদের সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং পরকালে মু'মিনদেরকে জান্নাত দেবেন ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।) ইনিই আল্লাহ্ (যাঁর এই শান) আমার পালনকর্তা। (তোমাদের বিরোধিতার কারণে যে কষ্ট ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে, সে সম্পর্কে) আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং (সব কাজে) তাঁরই প্রতি প্রত্যাগমন করি। (এতে তওহীদের বিষয়বস্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অতপর আরও গুণাবলী বর্ণনা করে একে অধিকতর জোরদার করা হয়েছে।) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা (এবং তোমাদেরও স্রষ্টা। সেমতে) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সমশ্রেণীর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং (এমনিভাবে) চতুষ্পদ জন্তুদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে (অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে) তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। (তাঁর সত্তা ও গুণ এমন পরিপূর্ণ যে,) কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (অন্যদের শোনা ও দেখা খুবই সীমিত।) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই ইখতিয়ারে। (অর্থাৎ এসবে কর্ম পরিচালনার অধিকার একমাত্র তাঁরই। আর তাঁর এক কর্ম পরিচালনা এই যে,) তিনি যার জন্য ইচ্ছা, অধিক রিযিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) জীবিকা পরিমিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী (প্রত্যেককে উপযোগিতা অনুযায়ী দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ——অর্থাৎ যে ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্র ফয়সালাই আসল ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ——অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রসূলের এবং কোন কোন আয়াতে শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নয়।

কেননা, রসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী ফয়সালা করলে তা আল্লাহ্র ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন, তবে ইজতিহাদের ভিত্তিও কোরআন ও সুন্নাহ্ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে আল্লাহ্ তা'আলারই ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এ দিক দিয়ে আল্লাহ্র বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, কোরআন ও সুন্নাহ্ বোঝার যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই শরীয়তের বিধান।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ
اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ
اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝
فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۭ
اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۭ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

(১৩) তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর

এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। (১৫) সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি নূহ (আ)-কে দিয়েছিলেন এবং যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি যার আর আদেশ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-কে দিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং এতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (এখানে 'ধর্ম' বলে সকল শরীয়তের অভিন্ন মূলনীতি বোঝানো হয়েছে। যেমন, তওহীদ, রিসালত, পুনরুত্থান ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ পরিবর্তন ও বর্জন না করা। বিভেদ সৃষ্টির অর্থ কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ও কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করা অথবা কোন একজনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্যদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। সার কথা এই যে, তওহীদ ইত্যাদি বিষয় সনাতন ধর্ম এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত সকল শরীয়তে সর্বসম্মত। এ প্রসঙ্গেই রিসালতও সমর্থিত হয়ে গেছে। সুতরাং এটা কবুল করতে কারও ইতস্তত করা উচিত ছিল না, কিন্তু তবুও) মুশরিকদের কাছে সে বিষয় (অর্থাৎ তওহীদ) দুঃসাধ্য মনে হয়, যার প্রতি আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন। (আর এটাও বাস্তব সত্য যে,) আল্লাহ্ নিজের দিকে যাকে ইচ্ছা আকৃষ্ট করেন (অর্থাৎ সত্যধর্ম কবুল করার তওফীক দেন) এবং যে আল্লাহ্র অভিমুখী হয় তাকে পথ প্রদর্শন করেন। মোটকথা, মুশরিকদের পরিচয় হচ্ছে অস্বীকার করা এবং মু'মিনদের গুণ হচ্ছে আল্লাহ্র মনোনয়ন লাভ করা ও সুপথ পাওয়া। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও বিভেদ সৃষ্টি না করার আদেশের উপর পূর্ববর্তী উম্মতদের অনেকেই কায়েম থাকেনি এবং বিভক্ত হয়ে যায়। এর কারণ সন্দেহ ও সংশয় ছিল না, বরং) তাদের কাছে (অর্থাৎ তাদের শ্রবণে সঠিক) জ্ঞান আসার পরই কেবল তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে (প্রথমে ধন-সম্পদ, প্রভাব-

প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব-কামনার কারণে তাদের স্বার্থ বিভিন্নরূপ হয়েছে, অতপর বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মকেও পারস্পরিক ছিদ্রান্বেষণ ও দোষারোপের হাতিয়ার করা হয় এবং আস্তে আস্তে ধর্মেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। সত্যকে বোঝার পর বিভক্ত হওয়ার এই গুরুতর অপরাধের কারণে তারা এমন কঠোর আযাবের যোগ্য হয়ে গিয়েছিল যে,) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত (যে, তাদের প্রতিশ্রুত আযাব পরকালে হবে), তবে (দুনিয়াতেই) তাদের (মতভেদের) ফয়সালা হয়ে যেত। (অর্থাৎ আযাব দ্বারা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হত। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল না, তাদের উপর আযাব এসেছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে, ঈমানের বরকতে তাদের উপর আযাব আসেনি। এর কারণ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দানের পূর্ব সিদ্ধান্ত।) তাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের) পরে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, [অর্থাৎ আরবের মুশরিক সম্প্রদায়কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র মাধ্যমে কোরআন দেয়া হয়েছে।] তারা এ ব্যাপারে অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। সুতরাং আপনি কারও অস্বীকৃতির দরুন মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না, বরং পূর্ব থেকে যে তওহীদের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তারই দিকে দাওয়াত দিন এবং (فَلِذٰلِكَ فَادْعُ) আদেশ অনুযায়ী (তাতেই) অবিচল থাকুন। আপনি তাদের (দুষ্ট) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (অর্থাৎ তাদের বিরোধিতার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি দাওয়াত পরিত্যাগ করুন। কাজেই আপনি দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন না।) আপনি বলুন, (যে বিষয়ের দিকে আমি তোমাদেরকে আহবান করি, আমি নিজেও তা পালন করি। সেমতে) আল্লাহ্ যত কিতাব নাযিল করেছেন, (কোরআনও তার মধ্যে একটি) আমি সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখি। আমি (আমার ও) তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। (অর্থাৎ যে বিষয়গুলো তোমাদের উপর ওয়াজিব বলি, নিজের জন্যও তা ওয়াজিব বলেই মনে করি। এতেও যদি তোমরা নমনীয় না হও, তবে শেষ কথা এই যে,) আল্লাহ্ আমাদেরও মালিক তোমাদেরও মালিক (এবং সবার শাসক)। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ্ (যিনি সবার মালিক, কিয়ামতে) আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন। (নিঃসন্দেহে) তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (তিনি আমল অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। এখন তোমাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন। তবে আমি যথারীতি প্রচারকার্য চালিয়ে যাব।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক

নেয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আ) ও সর্বশেষ আমাদের রসূল (সা) এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নবুয়ত স্বীকার করত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র ভক্ত ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আযহাবেও পয়গম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচজন পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী (সা)-র নাম প্রথমে এবং নূহ (আ)-র নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া (সা.) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুয়ত বন্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে।— (ইবনে মাজা, দারেমী)

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তাঁর নামের উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্ব প্রথম পয়গম্বর ছিলেন আদম (আ.)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ্ (আ.)-র আমল থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে নূহ (আ.)-ই প্রথম পয়গম্বর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ—এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যে দীন বা ধর্ম মতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারামঃ এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস—যেমন তওহীদ, রিসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত—যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও

যাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মত অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গম্বরগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ---অতএব পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেনঃ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ---এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।---(মাযহারী)

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসের কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه ---অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধহাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে ইসলামের বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেনঃ يد الله على الجماعة --অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহ্র রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা--পৃথক না থাকা।---(মাযহারী)

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تفرق শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয়ঃ শাখাগত মাস'আলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোন

বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মত-ভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রসূলুল্লাহ (সা)-র আমল থেকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত।

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ---অর্থাৎ তওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ খেয়াল-খুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরল পথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ---অর্থাৎ সরলপথ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। এক---আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরল পথের জন্য মনো-নীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলে। যেমন, পয়গম্বর ও ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

إِنَّآ أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ---অর্থাৎ আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্য খাঁটিভাবে তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কোর-আনে مُخْلَصٌ (অর্থাৎ মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হিদায়ত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ---যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্ তাকে সত্য ধর্মের হিদায়ত দান করেন। يَهْدِىْٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ---বাক্যের অর্থ তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব মুশরিকদের কাছে তওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে কুরাইশ কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাসের মতে যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রসূলে করীম (সা)-এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গম্বরগণের ধর্ম

থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সরল-পথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ কাফিরদের কথা বলা হোক---উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ -

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে আয়াতুল-কুরসীই এর একমাত্র নযীর। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে فَلِذٰلِكَ فَادْعُ---অর্থাৎ যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয় বিধান---وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। একারণেই কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ شيبتنى هود অর্থাৎ সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদেও এই আদেশ এভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান---وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ---অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান---قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ---অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করুন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি

আমি বিশ্বাসী। পঞ্চম বিধান—أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ—এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে عدل—এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি—এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না। ষষ্ঠ বিধান—اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সকলের পালনকর্তা। সপ্তম বিধান—لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ—অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না। এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশতই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে।—(কুরতুবী)

অষ্টম বিধান—لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ—অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই। নবম বিধান—اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান—وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ—অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ

دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝١٦ اَللّٰهُ
الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝١٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۭ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ۝١٨

(১৬) আল্লাহ্‌র দীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহ্‌ই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী। (১৮) যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে ত্বরিত কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্ তা'আলা (অর্থাৎ তাঁর) দীন সম্পর্কে (মুসলমানদের সাথে) বিতর্ক করে, তা মেনে নেয়ার পর, (অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যখন এ ধর্ম মেনে নিয়েছে, তখন দলীল স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিতর্ক করা অধিক নিন্দনীয়।) তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে অর্থহীন। তাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র) গযব (আসবে) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (সেই আযাব থেকে বাঁচার উপায় এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর দীনকে মেনে নাও। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সম্বলিত তাঁর কিতাবকে অবশ্য পালনীয় মনে কর। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলাই সত্যসহ (এই) কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) ও (তাঁর বিশেষ আদেশ) ন্যায়বিচার নাযিল করেছেন। (আল্লাহ্‌র কিতাবকে না মেনে আল্লাহ্‌কে মানা ধর্তব্য নয়। কোন কোন অমুসলিম আল্লাহ্‌কে মানে বলে দাবি করে, কিন্তু কোরআন মানে না। অতএব তাদের এই মানা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। তারা আপনাকে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ জিজ্ঞাসা করে,) আপনি কি জানেন (অবশ্য না জানলেই তা না হওয়া জরুরী হয় না, বরং তা নিশ্চয়ই হবে। দিন-তারিখ সম্পর্কে সংক্ষেপে

এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে,) সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন। (কিন্তু) যারা তাতে বিশ্বাস করে না, তারা (সেদিনকে ভয় করার পরিবর্তে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অস্বীকারকারীর দলে) কিয়ামতের তাগাদা করে (যে, কিয়ামত তাড়াতাড়ি আসে না কেন? আর) যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে। (ও কাঁপে) এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, (এই দু'প্রকার লোকের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ) যারা কিয়ামত (মানে না এবং সে) সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গভীর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্ববাসীকে দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফির শুনতে ও মানতেই রাযী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খৃস্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কুরায়শ কাফিরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কোরআন পাক উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতণ্ডা অসার ও পথ-ভ্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গযব তোমাদের উপরই পড়বে। অতপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হকের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ এখানে 'কিতাব' বলে কোরআনসহ সমস্ত ঐশী গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং 'হক' বলে পূর্বোক্ত সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে। ميزان-এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়িপাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেওয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় হক এবং ميزان শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

'মুমিনরা কিয়ামতকে ভয় করে'—এর অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্তু নিজেদের কর্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে

দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন মু'মিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়—তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘ্র কিয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ শুনে কিয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾
مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ
يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

(১৯) আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু! তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তারা ইহকালের ধন-সম্পদে গর্বিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। তারা বলে, আমাদের কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হলে আমাদেরকে এ বিলাস-বৈভব দান করতেন না। মনে রেখো, এটা তাদের ভুল। ইহকালের ধন-সম্পদ সন্তুষ্টির পরিচায়ক নয়; বরং এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ (দুনিয়াতে) তাঁর বান্দাদের প্রতি (সাধারণত) দয়ালু। (এ সাধারণ দয়াবশত তিনি সবাইকে রিযিক দেন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দান করেন। এতে উপযোগিতার ও রহস্যের ভিত্তিতে কমবেশীও হয়।) তিনি যাকে (যে পরিমাণ) ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। কিন্তু রিযিক সবাইকেই দেন। ইহকালে এ দয়া দেখে মনে করা যে, তাদের তরীকা সত্য এবং পরকালেও এরূপ দয়া হবে—এটা পরিষ্কার ধোঁকা। সেখানে তাদের কুকর্মের শাস্তি হবে। এ আযাব দেওয়া অসম্ভব নয়; কেননা, তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (তাদের সকল অনিষ্টের মূল ইহকালীন ধন-সম্পদের গর্ব। তাদের উচিত এ থেকে বিরত হয়ে পরকালের চিন্তা করা; কেননা) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার সে ফসল বাড়িয়ে দেব। (সৎকর্ম হল ফসল এবং সওয়াব হল তার ফল। 'বাড়িয়ে দেয়া' মানে বহুগুণ সওয়াব দেওয়া। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, একটি সৎকর্মের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। আর, যে ইহকালের ফসল কামনা করে (অর্থাৎ যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্র দুনিয়ার ভোগসম্ভার লাভের লক্ষ্যে করে এবং পরকালের জন্য কিছুই করে

না), আমি তাকে (ইচ্ছা করলে) কিছু দিয়ে দেব এবং পরকালে তার কোন অংশ নেই। (কেননা পরকালে অংশ পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের মধ্যে নেই।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ—অভিধানে لطيف শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস এর অনুবাদ করেছেন 'দয়ালু' এবং মুকাতিল করেছেন 'অনুগ্রহকারী'।

হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফির এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী لطيف শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহ্র রিযিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিযিক বণ্টনে তিনি ভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, রিযিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা দু'রকম। এক—তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিযিক একযোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাযত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাযতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।—(মাযহারী)

একটি পরীক্ষিত আমলঃ মওলানা শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (র.) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার اَللّٰهُ لَطِيْفٌ আয়াতটি اَلْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ—পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিযিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ
بِهِمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ
مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِيْ
يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ
فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

(২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। (২৩) এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তার সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

(সত্য ধর্ম তো আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন; কিন্তু তারা এটা মানে না। তবে) তাদের কি (খোদায়ীতে) শরীক কোন দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে কর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? (উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন সত্তা নেই, যার নির্ধারিত ধর্ম আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ধর্তব্য হতে পারে।) যদি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই পাপিষ্ঠদের প্রকৃত আযাব মৃত্যুর পরে হবে বলে) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই কার্যত) তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় (পরকাল এই) যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সেদিন) আপনি কাফিরদেরকে

তাদের কৃতকর্মের (শাস্তির আশংকার) কারণে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তা (অর্থাৎ সে শাস্তি) তাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এ হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা,) আর যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে (অবস্থান করতে) থাকবে। (জান্নাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই একটা জান্নাত। প্রতি স্তরে বহু উদ্যান রয়েছে। এসব কারণে শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। বিভিন্ন মর্তবা অনুযায়ী জান্নাতীরা বিভিন্ন স্তরে থাকবে।) তারা যা চাইবে, তাই তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তাঁর সে বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। (কাফিররা পূর্ণ বিষয়বস্তু শেষ করার আগে কাফিরদেরকে মধ্যবর্তী বাক্যে এক হৃদয়গ্রাহী বিষয়বস্তু শোনাবার আদেশ করা হচ্ছে ঃ) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমি তোমাদের কাছে আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কিছু চাই না। (অর্থাৎ এতটুকুই চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা কি আত্মীয়তার অধিকার নয় যে, তোমরা তড়িঘড়ি আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ না কর; শান্ত মনে আমার পূর্ণ কথা শুন এবং সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই কর? সঙ্গত হলে মেনে নাও, সন্দেহ থাকলে দূর করে নাও। ভ্রান্ত হলে আমাকে বুঝিয়ে দাও। মোটকথা, সবই শুভেচ্ছার মনোভাব সহকারে হওয়া উচিত। আগপাছ না দেখে উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। অতপর মু'মিনদের জন্য সুসংবাদের পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে—) যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য পুণ্য বাড়িয়ে দেই (অর্থাৎ প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সওয়াব দিয়ে দেই)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (অনুগত বান্দাদের পাপ) ক্ষমাকারী (এবং তাদের সৎকর্মের ব্যাপারে) গুণগ্রাহী (সওয়াবদানকারী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لَّآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى —সার সংক্ষেপে বর্ণিত

এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলা বাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নযীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেনঃ

ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم + بهن فلول من قراع الكتائب

অর্থাৎ কোন এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্য এটা কোন দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। জনৈক উর্দু কবি বলেনঃ — مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں

এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সারকথা এই যে, আত্মীয়বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ্ তা'আলাই দেবেন। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা.) সকলের সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেনঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسط الناس فى قريش
ليس بطن من بطونهم الا وقد ولده فقال الله تعالى قا انى لا اسئلكم
اجرا على ما ادعوكم عليه الا المودة فى القربى تودونى لقرابتى
منكم وتحفظونى بها -

রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরায়শদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর। ——(রূহুল-মা'আনী)

ইবনে জরীব প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন ঃ

يا قوم اذا ابيتم ان تتابعونى فاحفظوا قرابتى منكم ولا تكون غيركم من العرب اولى بحفظى ونصرتى منكم

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না।---(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাযিল হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই সুয়ূতী ও হাফেয ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এই রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্বরগণ বিশেষত সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত ঃ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোন গুরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোন হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের

তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলিমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন ঃ

يا راكبا قف بالمحصب من منى
واهتف بساكن خيفها والناهض
سحرا اذا فاض الحجيج الى منى
فيضا كملتطم الفرات الفائض
ان كان رفضا حب ال محمد
فليشهد الثقلان انى رافضى

হে অশ্বারোহী, তুমি মুহাস্‌সাব উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যূষে যখন হাজীদের স্রোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জ্বিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেযী।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

(২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন ? আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুত তিনি মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর-নিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (২৬) তিনি

মু'মিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি (আপনার সম্পর্কে) বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন (অর্থাৎ নবুয়ত ও ওহী সম্পর্কে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করেছেন? তাদের এ উক্তিই মিথ্যা অপবাদ। কেননা, আপনার মুখে আল্লাহ্‌র অলৌকিক কালাম জারি হয়েছে, যা নবী ব্যতীত কারও মুখে জারি হতে পারে না। আপনি রিসালতের দাবীতে সত্যবাদী না হলে আল্লাহ্ এই কালাম আপনার মুখে জারি করতেন না। সেমতে) আল্লাহ্ (এই ক্ষমতা রাখেন যে,) ইচ্ছা করলে তিনি আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন (এবং এই কালাম আপনার অন্তরে জারি হত না; বরং ছিনিয়ে নেয়া হত এবং আপনি বিস্মৃত হতেন। এমতাবস্থায় তা মুখে প্রকাশ পেত না।) আল্লাহ্ মিথ্যাকে (অর্থাৎ নবুয়তের মিথ্যা দাবীকে) মিটিয়ে দেন (চালু হতে দেন না, অর্থাৎ মিথ্যা দাবীদারের হাতে মোজেযা প্রকাশ পায় না) এবং (নবুয়তের) সত্য (দাবী)-কে আপন নির্দেশাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (ও প্রবল) করেন। (সুতরাং আপনি সত্যবাদী ও তারা মিথ্যাবাদী। যেহেতু) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ জ্ঞাত। (মুখের উক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম সম্পর্কে তো আরও জ্ঞাত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে জানেন এবং এগুলোর কারণে শাস্তি দেবেন। তবে যারা কুফর ও কুকর্ম থেকে তওবা করবে, তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা, তাঁর আইন এই যে,) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা (শর্ত অনুযায়ী হলে) কবুল করেন, (তওবার বরকতে) অতীত পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা কর, তা (সবই) জানেন। (সুতরাং তওবা খাঁটি কি না তাও তিনি জানেন। যে ব্যক্তি তওবার মাধ্যমে মুসলমান হয়, তার সেসব ইবাদত কবুল হবে যা পূর্বে কবুল হত না। কেননা,) তিনি মু'মিন ও সৎকর্মীদের ইবাদত (রিয়ার উদ্দেশ্যে করা না হলে) কবুল করেন (অর্থাৎ ইবাদতের সওয়াব দেন) এবং (প্রাপ্য সওয়াব ছাড়াও) তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে অধিকতর (সওয়াব) দান করেন (পক্ষান্তরে) যারা কাফির তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও কোরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যা দানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গম্বরের মু'জিযা ও যাদুকরের যাদু---এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরগণের

নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু'জিযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোন এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মু'জিযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন না; নবুয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই তার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিযাও দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাযিল করেন।

কোরআন পাকও এক মু'জিযা। সারা বিশ্বের জ্বিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী করীম (সা)-এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মু'জিযা উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওহী ও রিসালত সম্পর্কিত দাবি সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপঃ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গোনাহ্ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

এক. বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, দুই. অতীতের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং তিন. ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরয কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাযা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোন ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে---যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারও গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোনাহ্ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ্ থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ্ থেকে তওবা করলেও আহ্‌লে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গোনাহ্ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ্ বহাল থাকবে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ
مَّا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ
الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۭ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ
دَاۗبَّةٍ ۭ وَهُوَ عَلٰي جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۗءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ
مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ
فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾
وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ
رَوَاكِدَ عَلٰي ظَهْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾ اَوْ
يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ
فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

(২৭) যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে

একত্র করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (৩২) সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী, কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৩৫) এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞাগুণের অন্যতম বিকাশ এই যে, তিনি সমস্ত মানুষকে প্রচুর ধনসম্পদ দেননি, কেননা,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বান্দাকে (তাদের বর্তমান মনমানসিকতার অবস্থায়) প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে (ব্যাপকাকারে) বিপর্যয় সৃষ্টি করত। (কারণ, সবাই বিত্তশালী হলে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না, ফলে কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না।) কিন্তু (তিনি সবাইকে বঞ্চিতও করেননি, বরং) তিনি যতটুকু রিযিক ইচ্ছা করেন, পরিমাণ করে (প্রত্যেকের জন্য) নাযিল করেন। (কেননা,) তিনি তাঁর বান্দাদের (উপযোগিতার) খবর রাখেন, (তাদের অবস্থা) দেখেন। মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি (মাঝে মাঝে) বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং স্বীয় রহমত (এর চিহ্ন পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দেন। (উদ্ভিদ, ফলমূল ইত্যাদি রহমতের চিহ্ন।) তিনি (সবার) কার্যনির্বাহী, (এবং এ কারণে) প্রশংসার যোগ্য। তাঁর (কুদরতের) এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল, জীবজন্তুর সৃষ্টি, যা তিনি এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি (কিয়ামতের দিন) এগুলোকে (পুনরুজ্জীবিত করে) একত্র করতেও সক্ষম যখন (একত্রীকরণের) ইচ্ছা করেন। (তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাকারীও বটে। সেমতে) তোমাদের উপর (হে গোনাহ্গাররা,) যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই (কোন কোন পাপ) কর্মের ফল এবং তিনি অনেক গোনাহ্ (উভয় জাহানে অথবা কেবল দুনিয়াতে) ক্ষমা করে দেন। (তিনি যদি সব গোনাহ্র কারণে ধরপাকড় শুরু করেন, তবে) তোমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে) পালিয়ে গিয়ে আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না। (সুতরাং এমতাবস্থায়) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমার কোন কার্যনির্বাহী ও সাহায্যকারী হতে পারে না। সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম (উচ্চ) জাহাজসমূহ তাঁর (কুদরতের) অন্যতম নিদর্শন। (অর্থাৎ এগুলোর সমুদ্রে চলা আল্লাহ্র অত্যাশ্চর্য কারিগরির দলীল। নতুবা) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে। (তাঁরই কাজ বাতাস চালনা করা। বাতাসে ভর করেই জাহাজসমূহ চলে।) নিশ্চয় এতে প্রত্যেক কৃতজ্ঞ ও

সবরকারীর জন্য (কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা লোকমানে এ রকম বাক্যে এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে জাহাজসমূহকে নিশ্চল করে দেন,) অথবা (তিনি ইচ্ছা করলে প্রবল বাতাস প্রবাহিত করে আরোহীদের সহ) জাহাজসমূহকে তাদের (কুফর ইত্যাদি) কর্মের কারণে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করেন। (অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে নিমজ্জিত হয় না) যদিও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে এবং (এই ধ্বংসলীলার সময়) আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ককারীরা যেন জানে যে, (এখন) তাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। (কেননা, এহেন মহা বিপদে তারাও তাদের কল্পিত দেবতাদেরকে অক্ষম মনে করত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলীল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের ইবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যত কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিযিক ও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। ——(তফসীরে-কবীর)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা কাফিরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত (রা) বলেন, আমরা যখন বনূ-কুরায়যা, বনূ-নুযায়ের ও বনূ কায়নুকার অগাধ ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত উমর ইবনে হুরায়স (রা) বলেন, সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের

মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ ঃ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি, কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক জানেন কার জন্য কোন্ নিয়ামত উপযুক্ত এবং কোন্ নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তাভাবনা করে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই

দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ আয়াতের তফসীরে ইন্‌শাআল্লাহ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য ঃ এখানে খট্‌কা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণত বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহ) 'বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন---(বয়ানুল-কোরআন)

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য---মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হত না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ থাকবে----মন্দের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا ---(মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে 'নিরাশ হওয়ার পর' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহ্‌র

কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তদ্বির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ——অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دَابَّة বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীবজন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্ট বস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তুও হতে পারে, যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপযোগিতাবশত আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেন নি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র তওহীদ ব্যক্ত করে। এর পর কারও কোন কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ——বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে---এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গোনাহ্‌র কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গোনাহ্‌র শাস্তি দেন না, বরং যেসব গোনাহ্‌র শাস্তি দেন না, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহ্‌র কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহ্‌র ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ্ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম 'দাওয়ায়ে-শফী' গ্রন্থে লিখেন——গোনাহ্‌র এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গোনাহ্ হতে পারে না। তারা যদি কোন কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য

কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মু'মিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। —(মাযহারী)

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟
لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ
يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَٰٓؤُا۟
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ
إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم
مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى
ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَن صَبَرَ
وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

(৩৬) অতএব তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও

আপস করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৪১) নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তোমরা উপরে শুনেছ যে, দুনিয়াকামীদের সব আশাই পূর্ণ হয় না এবং তারা পরকাল থেকে বঞ্চিত থাকে, পক্ষান্তরে পরকালকামীরা উন্নতি লাভ করে। আরও শুনেছ যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের পরিণাম শুভ নয়, প্রায়ই এ থেকে ক্ষতিকর কর্ম জন্মলাভ করে।) অতএব (প্রমাণিত হল যে, অভীষ্ট অর্জনের উপযুক্ত স্থান দুনিয়া নয়----পরকাল। তবে দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রীর মধ্য থেকে) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগমাত্র। (জীবনাবসানের সাথে সাথে এগুলোরও অবসান ঘটবে।) আর আল্লাহ্‌র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব) আছে, তা (গুণগত দিক দিয়েও) উৎকৃষ্ট এবং (পরিমাণগত দিক দিয়েও) অধিক স্থায়ী। (অর্থাৎ সদাসর্বদা থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কামনা বাদ দিয়ে পরকাল কামনা কর। কিন্তু পরকাল অর্জনের জন্য ন্যূনতম শর্ত ঈমান আনা ও কুফর ত্যাগ করা। পরকালের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার জন্য সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা ও যাবতীয় গোনাহ্ বর্জন করা জরুরী। নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করার জন্য নফল ইবাদত করা এবং উত্তম নয়, এমন বৈধ কর্ম বর্জন করাও পছন্দনীয়। সেমতে পরকালের) এ সওয়াব তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে এবং যারা (বিশেষত) বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে (অধিক) বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে এবং যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই, এমন) কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা (কোন পক্ষ থেকে) অত্যাচারিত হলে (প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে) সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে (বাড়াবাড়ি করে না। এরূপ অর্থ নয় যে, ক্ষমা করে না। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি যে,) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (যদি কাজটি গোনাহ্‌র কাজ না হয়। অতপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি সত্ত্বেও) যে ক্ষমা করে ও (পারস্পরিক ব্যাপারে) আপস-নিষ্পত্তি করে, (যার ফলে শত্রুতা বিলুপ্ত হয়ে বন্ধুত্ব) গড়ে উঠে। তার পুরস্কার (ওয়াদা অনুযায়ী) আল্লাহ্‌র যিম্মায় রয়েছে। (যারা প্রতিশোধ গ্রহণে বাড়াবাড়ি করে, তারা শুনে রাখুক,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা

অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর যে (বাড়াবাড়ি করে না, বরং) অত্যাচারিত হওয়ার পর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর (শুরুতেই) অত্যাচার চালায় (কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের সময়) এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। (আর এই বিদ্রোহই অত্যাচারের কারণ হয়ে যায়।) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যে ব্যক্তি (অপরের অত্যাচারে) সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ (অর্থাৎ এরূপ করা উত্তম ও বীরত্বের পরিচায়ক)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামত-সমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্মও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ্ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না, বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। "আইন অনুযায়ী" বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুনঃ

প্রথম গুণ—عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ—অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালন-কর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় গুণ—اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ যারা মহাপাপ বিশেষত অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ্ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

কবীরা গোনাহ্সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্ই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহ্কে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ্ সাধারণ কবীরা গোনাহ্ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানের জন্য فَوَاحِش শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যে সব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়,

সেগুলোকেও فواحش তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু-প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ—وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ—অর্থাৎ তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মীদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ—اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ—এর অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবূল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরয কর্মসমূহের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ—অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামায পড়ে।

পঞ্চম গুণ—وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ—অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয় অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে امر শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা সাধারণের পরিভাষায় امر শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ আয়াতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন-দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনও

পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে মূর্খতাযুগের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনরা উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে ঢালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। মা'আরেফুল-কোরআন দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষে কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা ঃ খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে বললেন--- اجمعوا له العابدين من امتى واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأى واحد ---এর জন্য আমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারও একক মতে ফয়সালা করো না।

এ রেওয়ায়েতের কোন কোন ভাষায় عابدين ও فقهاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ফিকাহ্‌বিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হিদায়ত করবেন। অর্থাৎ যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন ঃ

ما تشاور قوم قط الا هدوا لارشد امرهم ---যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে--তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হবে অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।---(রূহুল মা'আনী)

ষষ্ঠ গুণ---وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ----অর্থাৎ তারা আল্লাহ্-প্রদত্ত রিযিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাযের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্য মসজিদ-সমূহে দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।---(রূহুল-মা'আনী)

সপ্তম গুণ---وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ---অর্থাৎ তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালংঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয় বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা লংঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে— وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

---অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারীরিক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বল-পূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্য তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে,---- فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

---অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র